ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 700-707
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.059

আধুনিক নর-নারীর দাম্পত্য জীবনের বহুমাত্রিক সংকট: প্রসঙ্গ 'বিষবৃক্ষ', 'ঘরে বাইরে' ও 'গৃহদাহ' উপন্যাস

ড. বাপি চন্দ্র দাস, *সহকারী অধ্যাপক, সাপটগ্রাম মহাবিদ্যালয়, সাপটগ্রাম, আসাম, ভারত*

Received: 16.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

To analyze the multifaceted crises in the marital lives of modern men and women, this dissertation selects three novels by three modern Bengali literary figures. The selected novels are Bankim Chandra Chattopadhyay's Bishabriksha (1873), Rabindranath Tagore's Ghare Baire (1916), and Sarat Chandra Chattopadhyay's Grihadaha (1920). Although numerous other works, such as Bankim's Kapalakundala (1866), Krishnakanter Will (1878), and Rajani (1877), Rabindranath's Chokher Bali (1903) and Jogajog (1929), and Sarat Chandra's Charitraheen (1917) and Sesh Prashna (1931), reflect similar marital issues, we have focused on these three novels for ease of analysis.Examining these three novels reveals a continuity in the crises of modern marital relationships. A common theme among these novels is the presence of love triangles. In Bishabriksha, the entry of Kundanandini into the married life of Nagendra and Surjamukhi creates a love triangle, leading to significant marital conflict. Similarly, in Ghare Baire, the arrival of Sandip in the marital life of Nikhilesh and Bimala forms a love triangle, introducing multifaceted marital crises. In Grihadaha, the active involvement of Suresh in the married life of Mahim and Achala exacerbates their marital problems.Bankim Chandra resolves the consequences of love triangles through moral and societal values. Rabindranath seeks resolution through self-awareness and the realization of inner freedom. Sarat Chandra, on the other hand, transcends moral and self-awareness to depict redemption through remorse and the acknowledgment of stigma.In this dissertation, we aim to explore the multifaceted crises in the marital lives of modern men and women through these three seminal works by these literary giants.

Keywords: marriage, society, love triangle, extramarital affairs, modernity, individualism.

ভূমিকা: কথাসাহিত্যে নর-নারীর দাম্পত্য জীবনে সম্পর্কের গভীরতা এবং সংকট ফুটে উঠে স্বাভাবিকভাবে। বিশেষত আধুনিক যুগের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিষবৃক্ষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘরে বাইরে, এবং শরৎচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়ের গৃহদাহ—এই তিনটি উপন্যাসে দাম্পত্য জীবনের বহুমাত্রিক সংকট নানাভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই রচনাগুলোতে দেখা যায়, দাম্পত্য জীবন শুধু একটি সম্পর্ক নয়; এটি সামাজিক কাঠামো, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, এবং প্রেম-ত্যাগের টানাপোড়েনের সমষ্টি। উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা কথা সাহিত্যের যুগটি ছিল সামাজিক পরিবর্তনের সময়। তখনকার সমাজে প্রথাগত দাম্পত্য সম্পর্কগুলি প্রায়শই পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তবে আধুনিকতা ও পশ্চিমি শিক্ষার প্রভাব, নারীর স্বাধীনতার প্রশ্ন, এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উত্থান দাম্পত্য জীবনে নতুন সংকটের সৃষ্টি করেছিল। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, ও শরৎচন্দ্র এই পরিবর্তনকে তুলে ধরেছেন তাদের রচনায়। বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষে দাম্পত্য জীবনের এক জটিল রূপ তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সূর্যমখী একজন কর্তব্যপরায়ণা স্ত্রী, কিন্তু তার বৈবাহিক সম্পর্ক নিছক কর্তব্যের বেড়াজালে আবদ্ধ। তার স্বামী নগেন্দ্রনাথের প্রতি তার প্রেম গভীর হলেও স্বামীর চরিত্রগত দুর্বলতা এবং কুন্দনন্দিনীর প্রতি আকর্ষণ দাম্পত্য সম্পর্ককে জটিল করে তোলে।এই উপন্যাসে বঙ্কিম দাম্পত্য জীবনের অভ্যন্তরীণ সংকট, যেমন—বিশ্বাসভঙ্গ, ত্যাগ, এবং আত্মপরিচয়ের প্রশ্নকে তুলে ধরেছেন। সূর্যমুখী যে ত্যাগ স্বামীর প্রতি করে, তা একদিকে তার প্রেমের গভীরতা, অন্যদিকে দাম্পত্য জীবনের অসমতাকে স্পষ্ট করে।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘরে বাইরেতে দাম্পত্য জীবনের সংকটকে ব্যক্তিগত আবেগ এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার দ্বন্দ্বের মধ্যে তুলে ধরেন। নিখিলেশ, বিমলা, এবং সন্দীপের সম্পর্কের জটিলতা এই উপন্যাসের মূল বিষয়। নিখিলেশ একজন উদার ও আধুনিক চিন্তাধারার স্বামী, কিন্তু বিমলার প্রতি তার নিঃশর্ত বিশ্বাস এবং স্বাধীনতার সুযোগ সৃষ্টির ইচ্ছা তাদের দাম্পত্য জীবনে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। বিমলা যখন সন্দীপের আদর্শে আকৃষ্ট হয়, তখন দাম্পত্য জীবনে বিশ্বাস, স্বাধীনতা, এবং সামাজিক প্রভাবের দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ এখানে দেখিয়েছেন, কেবলমাত্র ভালোবাসা বা উদারতা দিয়ে দাম্পত্য জীবনের সংকট মেটানো সম্ভব নয়; বরং সম্পর্কের ভারসাম্য এবং উভয়ের মানসিক সমতা গুরুত্বপূর্ণ। শরৎচন্দ্র গৃহদাহে দাম্পত্য জীবনের সংকটকে তীব্রভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। মহিম ও অচলার দাম্পত্য সম্পর্ক একদিকে প্রেমময়, অন্যদিকে তা সামাজিক শর্ত এবং ব্যক্তিগত সংকটে ভরপুর। সুরেশের অধিকারবোধ এবং ঈর্ষা দাম্পত্য জীবনে প্রেমের জটিল রূপকে উন্মোচিত করে। এই তিনটি উপন্যাস দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন সংকটকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, এবং শরৎচন্দ্রের এই তিনটি উপন্যাস আধুনিক নর-নারীর দাম্পত্য জীবনের বহুমাত্রিক সংকটকে তুলে ধরে। প্রেম, কর্তব্য, স্বাধীনতা, এবং আত্মপরিচয়ের টানাপোড়েন দাম্পত্য জীবনের জটিলতাকে আরও গভীর করেছে। এই সংকটগুলি কেবল ব্যক্তিগত নয়; এগুলো সামাজিক, রাজনৈতিক এবং মানবিক পরিবর্তনের প্রতিফলন। বাংলা কথাসাহিত্যের এই রচনাগুলিতে বিদ্যমান দাম্পত্য জীবনের সমস্যাগুলি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা আজও প্রাসঙ্গিক এবং মূল্যবান।

পদ্ধতি: প্রত্যেক গবেষণা অভিসন্দর্ভ কোনো না কোনো পদ্ধতিকে অবলম্বন করে রচিত হয়। তাই আমরা আমাদের বর্তমান অভিসন্দর্ভ চয়নে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিকে অবলম্বন করেছি।

বিশ্লেষণ: 'বিষবৃক্ষ' বঙ্গদর্শন পত্রিকায় মোট বারোটি কিস্তিতে প্রকাশিত হবার পর ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৯১ সালে শিয়ালকোট থেকে বিষবৃক্ষের হিন্দুস্তানি অনুবাদ প্রকাশিত হয় এবং ১৮৮৪ সালে মরিয়ম এস. নাইট 'The Poison Tree' নামে বিষবৃক্ষের ইংরেজি অনুবাদ করেন। "বিষবৃক্ষ উপন্যাসের বিষয়বস্তু ছিল সমসাময়িক বাঙালি হিন্দু সমাজের দুটি প্রধান সমস্যা বিধবা বিবাহ ও বহুবিবাহ

প্রথা। এই উপন্যাসের পটভূমি বিধবা বিবাহ আইন পাশ হওয়ার সমসাময়িক কাল। এই উপন্যাসের নায়িকা বিধবা কুন্দনন্দিনীর চরিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যার ছায়া অবলম্বনে রচিত বলে জানা যায়।"[১] যাই হোক উপন্যাসটি সামাজিক। পরিবারস্থিত চরিত্রের ক্রিয়া-কলাপে সমাজ চালিত হয়। আবার সমাজের বিধি নিয়মের নির্দেশিত পথ ও সমাজ পরিবর্তনের ধারায় চরিত্র ঘুরপাক খায়। বিষবৃক্ষের নগেন্দ্রনাথ, সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনী, হীরা ও দেবেন্দ্র প্রভৃতি মুখ্য চরিত্রগুলো সমাজের নিগূঢ় বন্ধনে আবদ্ধ। যখনই এই বন্ধনের বিপরীতে গিয়েছে তখনই আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। দাম্পত্য জীবন মানে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ স্বামী ও স্ত্রীর মিলন ও সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি সুস্থ প্রবাহ। উপন্যাসে জমিদার নগেন্দ্রনাথ দত্ত ও তার স্ত্রী সূর্যমুখীর মধুর মিলনে গড়ে ওঠে তাদের সুখী দাম্পত্য জীবন। কিন্তু তাদের দাম্পত্য জীবনে সংকট দেখা দেয় বিধবা হয়ে কুন্দননন্দিনীর প্রথাবর্তনে। কুন্দনন্দিনীর আগমনের পূর্বে তাদের দাম্পত্য জীবনে কোন সংকট বা সমস্যা ছিল না। একে অপরের প্রতি ছিল তাদের অবিচল বিশ্বাস ও ভালোবাসা। সেখানে সন্দেহ-ঘৃণা-অবহেলার কোন স্থান ছিল না। নদীর স্রোতের মতো গতিশীল ছিল তাদের দাম্পত্য জীবন। সূর্যমুখী স্বামী নগেন্দ্রনাথের প্রতি পরম বিশ্বাসের কারণেই অনাথা কুন্দনন্দিনীকে তাদের সংসারে স্থান দিয়ে দূর সম্পর্কের ভাইয়ের সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর অনাথা কুন্দনন্দিনী পুনরায় নগেন্দ্রনাথ-সূর্যমুখী দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করলে তাদের সংসারে অশান্তি নেমে আসে। তখন কুন্দনন্দিনী সতেরো বছরের যুবতী। তার রূপ যৌবন ঝলসে উঠেছে। কুন্দনন্দিনী যখন তেরো বছর বয়সে অনাথ হয়ে নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে এসেছিল। তখন কুন্দকে দেখে নগেন্দ্রনাথের মনে কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। কিন্তু সতেরো বছরের ভরা যৌবন নিয়ে যখন কুন্দনন্দিনীর প্রত্যাবর্তন ঘটে তখন নগেন্দ্রনাথ চিত্তসংযম করতে পারল না। কমলমণিকে লেখা সূর্যমুখীর চিঠিতে কুন্দনন্দিনীর প্রতি নগেন্দ্রের দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে উঠে, "তাহার চক্ষু এদিক ওদিক চাহে, কাহার সন্ধানে তা কি আমি বুঝিতে পারি না? দেখিলে আবার ব্যস্ত হইয়া চক্ষু ফিরাইয়া লয়েন, কেন তাহা কি বুঝিতে পারি না? কাহার কণ্ঠের শব্দ শুনিবার জন্য, আহারের সময়, গ্রাস হাতে করিয়াও কান তুলিয়া থাকেন, তাহা কি বুঝিতে পারি না? হাতের ভাত হাতে খাকে, কি সুখে দিতে কি মুখে দেন, তবু কান তুলিয়া থাকেন, কন? আবার কুন্দের স্বর কানে গেলে তখনই বড় জোরে হাপুস হাপুস ফিরিয়া ভাত খাইতে আরম্ভ করেন কেন, তা কি বুঝিতে পারিনা।"[২] নগেন্দ্র ধীরে ধীরে কুন্দনন্দিনীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল। নিজের চিত্ত দুর্বলতা ও বৈকল্যের জন্য তাদের দাম্পত্য জীবনে আগুন ধরল। নগেন্দ্রনাথ জমিদার, সমাজও বিধবা বিবাহ ও বহুবিবাহের জন্য অনুকূল ছিল। চাইলে কুন্দকে অনায়াসে বিয়ে করতে পারত। কিন্তু নগেন্দ্র মুখ ফুটিয়ে কথা বলতে ও দৃঢ়তার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে ভয় করল। আসলে সময়টা মধ্যযুগ নয়, আধুনিক যুগের জটিলতা যখন দানা বাঁধতে শুরু করেছে তখন বঙ্কিমের কলমে নগেন্দ্রনাথের আবির্ভাব। তাই নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীকে কোন প্রস্তাব না দিয়ে তাকে দেখলে লজ্জায় সরে যায়। আবার তার প্রতি আসক্ত হয়ে সূর্যমুখীর কাছ থেকে সরে আসে। সূর্যমুখী স্বামীর আচরণে অস্বাভাবিকতা দেখে অচিরেই বুঝতে পারল কুন্দনন্দিনীই তার স্বামীর ব্যাধির কারণ। সূর্যমুখী তখন সিদ্ধান্ত নিল স্বামীকে কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে সুখী করবে। সূর্যমুখী তা করতে পেরেছিল আধুনিক যুগের সূচনা লগ্নে। একবিংশ শতাব্দীর সূর্যমুখীরা নিশ্চয় স্বামীকে দ্বিতীয় বিয়ে দিত না। স্বামীকে ডিভোর্স কিংবা জেলে পাঠাত। সূর্যমুখী স্বামীকে বিয়ে দিয়ে স্বামীর সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসীর আশ্রমে স্থান নিয়েছিল। বিকল্প উপায়ে সে বিষপান ও করতে পারত। আধুনিক সময়ের প্রারম্ভে নারীরা দাম্পত্য কলহ থেকে নিষ্কৃতি পেতে এই দুটি পথ বেছে নিত। বর্তমান সময়ে ডিভোর্সই শেষ কথা। যদিও নগেন্দ্র সূর্যমুখীর জীবনে সংকট সৃষ্টি হওয়ার মূলে কুন্দনন্দিনীর সক্রিয় কোন

ভূমিকা ছিল না। কিন্তু তার উপস্থিতিতে নগেন্দ্রনাথের চিত্ত বৈকল্য ঘটে। তাই পরোক্ষভাবে সেও দায়ী। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের চরিত্র যখন বজ্র দৃঢ় হয় যখন তাদের চারিত্রিক স্খলন কোনো অবস্থাতেই হয় না, তখন স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে তৃতীয় কোন পুরুষ কিংবা নারীর আগমন ঘটলেও তাদের দাম্পত্য জীবনে কোনরূপ সংকট সৃষ্টি হতে পারে না। নগেন্দ্র যদি সতেরো বছরের যুবতী কুন্দনন্দিনীর প্রতি আসক্ত হত না তাহলে তাদের দাম্পত্য জীবনে চিড় ধরত না।এ বিষয়ে সমালোচক শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "গ্রন্থের কেন্দ্রগত বিষয়ে হইতেছে আত্ম সংযমে অক্ষম নগেন্দ্রনাথের রূপ মোহ এই অসংযত প্রবৃত্তির ফলে নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনী ও সূর্যমুখী তিনটি জীবনে একটা দারুন আলোড়ন সৃষ্টি। তিনটি জীবন সমুদ্র মন্থনে হলাহলোৎপত্তি।"৩ অবশ্য অনেক দেরিতে কুন্দনন্দিনীর প্রতি নগেন্দ্রের মোহ ভঙ্গ হয় এবং নগেন্দ্র সূর্যমুখী দাম্পত্য জীবন আবার জোড়া লাগে। কিন্তু নগেন্দ্রনাথের চিত্ত সংযমের অভাবে যে কুন্দনন্দিনীর জীবন ক্ষতবিক্ষত হয়ে অকালে মৃত্যু হয় তার জন্য দায়ী নগেন্দ্রনাথ। এ বিষয়ে সমালোচক বলেছেন, "নগেন্দ্রনাথ সূর্যমুখীর সুখী দাম্পত্যের মধ্যে হঠাৎই অসহায় সুন্দরী কুন্দনন্দিনীর আবির্ভাব। ক্রমে নগেন্দ্রনাথের কুঞ্জ আসক্তি তীব্র হয়ে উঠলো। এবং ত্রিকোণ প্রেম তথা দাম্পত্য দূরত্ব ও জটিলতা গভীরতা অর্জন করল। বিধবা বিবাহের প্রশ্নটিকে দূরে সরিয়ে রাখলেও এই অবৈধ সম্পর্কের ট্র্যাজিক পরিণতি ও শেষে অনেক মূল্য দিয়ে নগেন্দ্রনাথ ও সূর্যমুখীর মধুর মিলন। ভারতীয় তথা হিন্দু দাম্পত্যের মাধুর্য ও অটুট দায়িত্ব সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের দূর আস্থার মনোভাবই প্রতিষ্ঠা দেয়।"[৪]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি 'সবুজপত্র' পত্রিকায় ১৯১৫ সালে এবং গ্রন্থাকারে ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। উপন্যাসটিতে মোট আঠারটি আত্মকথা বা অনুচ্ছেদ আছে। উপন্যাসের নায়ক নিখিলেশের সাতটি আত্মকথা, নায়িকা বিমলার সাতটি আত্মকথা ও উপনায়ক সন্দীপের চারটি আত্মকথা রয়েছে। প্রতিটি আত্মকথার মধ্য দিয়ে নায়ক-নায়িকা ও উপনায়কের আত্মবিশ্লেষণ উদ্ভাসিত হয়েছে। আত্মবিশ্লেষণ করতে প্রয়োজন ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবোধ ও যুক্তি। যা আধুনিকতার একটা বড় প্রভাব। লক্ষণীয় নিখিলেশ, বিমলা ও সন্দীপ প্রত্যেকে আধুনিক চিন্তা ভাবনায় উদ্বুদ্ধ। সময়টা প্রাসঙ্গিক করে রবীন্দ্রনাথ এই মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস রচনা প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র যেমন চন্দ্রনাথ, পঞ্চু, অমূল্য, হরিশ কুন্ডু প্রভৃতি চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তেমন জোর না দিলে ও নিখিলেশ, বিমলা ও সন্দীপকে আধুনিকতার সার্বিক বৈশিষ্ট্যে সম্পৃক্ত করে চিত্রিত করেছেন। নিখিলেশ উচ্চ শিক্ষিত, বিমলা ও মিসের শিক্ষা প্রদানে ব্যক্তি চৈতন্যের বিকাশ ঘটিয়েছে। আর সন্দীপ স্বদেশী আন্দোলনের নেতা, তার মধ্যে যুক্তি- তর্কের অভাব নেই। সচেতন নিখিলেশ বিমলার দাম্পত্য জীবন সুখে তৃপ্তিতে নয়টা বছর কাটে। তাদের একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসা অটুট ছিল। কিন্তু এই নয়টি বছর সুখে থাকার দুটি কারণ বিদ্যমান। প্রথমত: নিখিলেশের চরিত্রে 'বিষবৃক্ষে'র নগেন্দ্রনাথের মতো কোন স্খলন দেখা যায়নি। বিমলার চেয়ে সুন্দরী ছিল নিখিলেশের বিধবা বৌদিরা। দ্বিতীয়তঃ বিমলা ঘরে থেকেই স্বামীকে দেখেছিল এতদিন, বাইরে থেকে নয়। বাইরের কোনো পুরুষের সঙ্গে তুলনা করে স্বামীকে দেখার অবকাশ পায় নি। বর্তমান সময়ে নারী কিংবা নর পর পুরুষ ও নারীর সঙ্গে নিজ স্বামী কিংবা স্ত্রীর তুলনা করে যখন দেখে তখনই তাদের দাম্পত্য জীবনে ফাটল ধরে। আধুনিক নর-নারীর মানস যুক্তি ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধে ভরা। তাই যে মুহূর্তে পর পুরুষ কিংবা নারীর প্রতি আসক্ত হয় সেই মুহূর্তে তাদের এতদিনের সাজানো ভালোবাসার দাম্পত্য জীবনে ফাটল ধরে। বিমলা যখন ঘরের বাইরে এসে সন্দীপের সাক্ষাৎ পায় তখন অনায়াসে সন্দীপের বাক্ পটুতায় মুগ্ধ হয়। তখন স্বাভাবিকভাবে নিজের স্বামীর সঙ্গে

সন্দীপের তুলনা করতে তাকে বিমলা মনের কোণে। নিখিলেশের উদারতা ও নিষ্ক্রিয় চিন্তাভাবনা এতকাল বিমলাকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু সন্দীপের উত্তেজনার কাছে তা হীন হয়ে পড়ে। নারী পুরুষের গুণের চেয়ে উত্তেজনায়ই বেশি আকর্ষিত হয়। বিমলার হৃদয়ের টানাপোড়েন নিখিলেশের বুঝতে দেরি হয়নি। নিখিলেশ তখন স্ত্রীর হাতের নিগড় হয়ে না থেকে বিমলাকে মুক্তি দিল। সেটা একমাত্র সম্ভব আধুনিক সময়ের উচ্চ শিক্ষিত মনে উদারচেতনা বোধের জন্য। মধ্যযুগে কোন পুরুষই নারীকে তার পুরুষতান্ত্রিক অনুশাসনের বেড়াজাল থেকে মুক্তি দিত না। বিমলা স্বাধীন হয়ে নিজেকে হারাতে বসে। সে প্রথমে সন্দীপকে স্বদেশের ভাবী নেতা কল্পনা করে নেয়। " কিন্তু সেদিন সন্দীপবাবু যখন বক্তৃতা দিতে লাগলেন আর এই বৃহৎ সভার হৃদয় দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠে কুল ছাপিয়ে ভেসে যাওয়ার জো হল তখন তার সে এক আশ্চর্য মূর্তি দেখলুম।"৫ কিন্তু সন্দীপের স্বার্থপরতা,লোভ,নীচতা ও মিথ্যাবাদী আচরণ চোখে পড়েনি। বিমলা সন্দীপের যত কাছে যেতে থাকে তত স্বামী নিখিলেশ থেকে দূরে সরে যায়। তবে সন্দীপের কাছে থেকে বুঝতে পেরেছে সন্দীপের চোখে কামনার আগুন জ্বলছে। কিন্তু কোন অনিবার্য বেগে সে সন্দীপের দিকে ধাবিত হচ্ছে সেও বুঝতে পারেনি। এ বিষয়ে শ্রী শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "স্বদেশী আন্দোলনের তীব্র উত্তেজনার মুখে নিখিলেশের নিষ্ক্রিয় নিরপেক্ষতা ও অবিচলিত নীতি জ্ঞানের সহিত সন্দীপের জ্বালাময় প্রচন্ড আবেগ ও প্রবল ইচ্ছা শক্তির তুলনা করিয়া সে তাহার স্বামীর মনোভাবকে কাপুরুষচিত দুর্বলতা বলিয়া ভ্রম করিয়াছে। তাহার ক্রমশ অজ্ঞাতসারে সে সন্দীপের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। সন্দীপ নানাবিধ কৌশলে তাহার মোহাবেশ ঘনাইয়া তুলিয়াছে।"[৬] সন্দীপের কথায় সে প্রণামীর গিনি মুদ্রা সিন্দুক থেকে চুরি করে স্বামীর ঘরকে কলঙ্কিত করেছে। নিজের গহনার বাক্স সন্দীপকে দিয়ে নিজেকে লজ্জিত করেছে ।এমনকি নিজের আপন ভাই তুল্য অমূল্যকে দিয়ে কাছারির টাকা চুরি করিয়েছে। তবে অমূল্যের সাহায্যে বিমলা সন্দীপের আসল মুখোশ চিনতে পারে। অবশেষে নিজের স্বামীর চরণে অশ্রু বিসর্জন করে বিমলা তার প্রায়শ্চিত্ত করে। লক্ষণীয় বিষবৃক্ষের কুন্দনন্দিনীর কোন সক্রিয় দোষ না থাকলেও নিখিলেশ বিমলার দাম্পত্য জীবন লন্ডভন্ড করার জন্য সন্দীপ বহুলাংশে দায়ী। নিজ বন্ধু নিখিলেশের প্রতি সন্দীপ চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। স্বদেশের নামে বন্ধুর ধন লুট করার পাশাপাশি বন্ধুর ঘরে লক্ষ্মীকে 'মক্ষীরানী' বলে অভিহিত করে ঘরের বাইরে বের করে এনে চরম অপমান করে তাদের দাম্পত্য জীবনকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। স্বদেশী আন্দোলনে গা ভাসিয়ে 'পরস্ত্রী মাতৃ সমান' এই বোধ সন্দীপ হারিয়েছে। যে পরের স্ত্রীকে মাতৃজ্ঞানের পূজা করতে পারেনি, সে কখনো দেশমাতৃকার আরাধনায় ব্রতী হয়ে প্রকৃত স্বদেশী আন্দোলনের নেতা হতে পারে না। সন্দীপের স্বদেশী ক্রিয়া-কলাপ ভন্ডামি ছাড়া আর কিছু নয়। আধুনিক নর-নারীর দাম্পত্য জীবনে তৃতীয় ব্যক্তির আগমনের কারণ স্বয়ং নর কিংবা নারীর তৃতীয় ব্যক্তির সম্পর্কে উদারতা, বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতাই দায়ী। তৃতীয় ব্যক্তি স্বামী-স্ত্রীর এই গুণাবলীর সুযোগে তাদের দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করে সহজেই তাদের দাম্পত্য জীবনকে কলুষিত ও ছারখার করে দেয়। যেমনটা করেছে সন্দীপ ও সুরেশ। ঘরে বাইরে উপন্যাসে নিখিলেশ বিমলার দাম্পত্য জীবনে ফাটল ধরা সম্পর্কে সমালোচকের উক্তিটি যথেষ্ট প্রণিধানযোগ্য - "নিখিলেশ বিমলার মধুর দাম্পত্যের মধ্যে শনিগ্রহের মতো ঢুকে পড়েছিল সন্দীপ। সাময়িকভাবে বিমলা সন্দীপের প্রতি মোহাবিষ্ট হয়। মোহমুক্ত হতেও বেশি সময় লাগে নি। কিন্তু সন্দীপের প্রবেশের পর এদের দাম্পত্য জীবনে অস্থিরতার ও সংকট দেখা দেয়।"[৭]

'গৃহদাহ' শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি বাস্তবধর্মী ত্রিকোণ প্রেমের উপন্যাস। উপন্যাসটি ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটিতে মোট ৪৪ টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। প্রধান চরিত্র মহিম, অচলা, সুরেশ,

কেদারনাথ,মৃণালিনী ও রামবাবু। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের ঠিক চার বছর পর 'গৃহদাহ' প্রকাশিত। ফলে নর-নারীর মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে উভয় উপন্যাসের মধ্যে একটু সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়। গৃহদাহের মহিম, সুরেশ উচ্চশিক্ষিত এবং অচলা উদারমনা ও প্রগতিশীল পরিবারের মেয়ে। নায়ক মহিম, নায়িকা অচলা ও উপনায়ক সুরেশকে নিয়ে ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনিই গৃহদাহের উপজীব্য বিষয়। অচলা বিয়ের পূর্ব থেকে মহিমকে ভালোবাসে। মহিমের দারিদ্রপূর্ণ সংসারের পরিচয় পেয়েও মহিমের সঙ্গে দাম্পত্য জীবনে পা দিয়েছে। কিন্তু মহিমের দেশের বাড়িতে এসে শ্বশুরের দারিদ্রপূর্ণ ঘরবাড়ি দেখে অচলার মন কষ্ট পায়। অচলার মন এই বাড়িতে বসতেই চায় না। আসলে অচলা কোনো নিরক্ষর মেয়ে নয়, তার মন যুক্তি দিয়ে ভালো-মন্দের তুলনা করতে জানে। নিজের বাপের বাড়ির অবস্থা সঙ্গে মহিমের বাড়ির অবস্থার দিনরাত তফাৎ। তাছাড়া অচলার মনকে মহিমের বন্ধু, তার প্রণয় প্রার্থী ধনী সুরেশের অবস্থাও প্রভাবিত করে পরোক্ষভাবে। বিয়ের আগে সুরেশের প্রস্তাবে সে রাজি না হয়ে যে ভুল করেছে এটাও তার অবচেতন মনে বাজতে থাকে। সুরেশের বাড়িতে অচলা বিয়ের পূর্বে গিয়েছে এবং সুরেশের ঘরবাড়ির আভিজাত্যতা দেখে বিস্মিত হয়েছে। তাই কী একটা অতৃপ্তিই তাকে মহিমের সঙ্গে দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে দিচ্ছে না। একথা নিশ্চিত করে বলা যায় মহিম অচলার বিয়ের পূর্বে যদি সুরেশের প্রবেশ তাদের জীবনে ঘটত না তাহলে স্বামীর দারিদ্রপূর্ণ সংসারে এসে অচলা মহিমকে নিয়ে দাম্পত্য জীবনে কিছুটা হলেও সুখী হতে পারত। তাছাড়া মৃণালিনী প্রতি অচলার অহেতুক সন্দেহই তাদের দাম্পত্য জীবন কিছুটা অসুখী করেছে। একদিকে সুরেশের প্রতি টান, অপরদিকে মহিমের সংসারের কদাচার পরিবেশে অচলা ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় মহিমের গ্রামের বাড়িতে হঠাৎ মহিম-অচলার দাম্পত্য জীবনে সুরেশের আগমন ঘটলে অচলা যেন মরুভূমিতে জল খুঁজে পায়। এ বিষয়ে সমালোচক শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "মহিমের পল্লীভবনে সুরেশের অনাহুত আগমনে স্বামী-স্ত্রীর এই বিরোধ সাংঘাতিক তীব্রতা লাভ করিল। তাহার অবস্থানের কয়েকদিন ধরিয়া তাহাদের অহোরাত্র ঘাত প্রতিঘাতে সুরেশের ধারণা জন্মিল যে অচলা বাস্তবিকই মহিমের প্রতি অনুরক্ত নহে। এই প্রতীতিই তাহার মনকে চরম বিশ্বাসঘাতকতার জন্য প্রস্তুত করিল।"[৮] তারপর মহিমের ঘরে আগুন লেগে মহিম সর্বস্বান্ত হলে অচলা যেন হাল্কা হল। মহিম সুরেশের সঙ্গে অচলাকে কলকাতায় তার বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলে অচলার মনে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি মহিম সম্পর্কে। সে সুরেশকে আগুনের মধ্যে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছে। কিন্তু নিজের স্বামীকে ছেড়ে যেতে একটুকুও দ্বিধাবোধ করেনি। তারপর দীর্ঘদিন পরে মহিমের অসুখের খবর পেয়ে সুরেশের বাড়িতে এসে কলের পুতুলের মতো স্বামীর সেবা করেছে ঠিকই। কিন্তু তার প্রাণমন কেড়ে নিয়েছিল সুরেশের বৈভব ও অযাচিত ভালবাসা। সে বুঝে উঠতে পারেনি যে সুরেশ তাকে কাছে পাওয়ার জন্য তার প্রতি বাড়তি খেয়াল নিচ্ছে,বন্ধুর স্ত্রী বলে নয়। অচলার এই বিবেকহীনতা ও সিদ্ধান্তহীনতার কারণে অচলা স্বামীকে যবলপুর হাওয়া বদলে নিয়ে যেতে সুরেশকে সঙ্গী করে। অচলা জানে যে তাদের প্রতি সুরেশের একটা বিদ্বেষ আছে, তাছাড়া সুরেশ ধীরে ধীরে তাকে কাছে চাইছে, তাসত্ত্বেও জেনে শুনে বিষ পান করার মতো সে সুরেশকে সঙ্গী করেছে। অবশ্য এলাহাবাদ থেকে স্বামীকে একাকী ট্রেনে ছেড়ে যাওয়াতে অচলার ইচ্ছা ছিল না। সুরেশ তার কামনার ধন অচলাকে কাছে পেতে বিবেক হারিয়ে অসুস্থ বন্ধুকে একাকী ফেলে যেতে একবার চিন্তা করেনি। সুরেশের চালাকিতে অচলা কেঁদেছে। কিন্তু সুরেশের কামানলে নিজেকে বিসর্জন দিতে অচলা নিজেকে থামায়নি।- "আজ জীবনের এই চরম মুহূর্তে অভিমান ও মোহই তাহার চিরজয়ী হইয়া রহিল। সে বাধা দিল না, কথা কহিল না, একবার পিছনে চাহিয়াও দেখিল না। একেবারে

নি:শব্দে ধীরে ধীরে সুরেশের শয়ন কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল।"[৯] অচলার অবচেতন মনে আগে থেকে এরকম একটা কিছু আশা করছিল। মহিমের দাম্পত্য জীবন ভেঙে অচলাকে হরণ করে সুরেশ টাকার জুড়ে ডিহরীতে বাড়ি তৈরি করে অবৈধ সংসার পাতলেও মানসিকভাবে অচলা ও সুরেশ একদিনের জন্য সুখ পায়নি। তাদের মনে পাপ বোধ তাদের শান্তিতে থাকতে দেয়নি। অবশেষে প্লেগ রোগে সুরেশের মৃত্যু ঘটান লেখক। আসলে বঙ্কিমের মতো শরৎচন্দ্র সামাজিক দায়বদ্ধতার বেড়াজাল মাড়াতে পারেন নি। তাই অচলা সুরেশের পরকীয়া প্রণয়ের পরিণতি বিচ্ছেদে ঘটিয়েছেন, মিলনে নয়। অনেকে বলতে পারেন শরৎচন্দ্র ইচ্ছাকৃতভাবে সুরেশের মৃত্যু ঘটিয়ে দেখিয়েছেন পরকীয়ায় লিপ্ত হলেই পাপ হয়। আসলে এটা ধ্রুব সত্য যে যৌন অপবিত্র হলেই ব্যক্তির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কবি কৃত্তিবাসও মনে করেন স্বামী বা স্ত্রী ছেড়ে পর স্ত্রী বা স্বামীর সঙ্গে রমণ করলে নরকে গমন হয়। এই বোধ আধুনিক শিক্ষিত নর-নারীর মধ্যে সকল সময় দেখা যায় না। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক নরনারী স্বার্থপর ভালবাসাকে বেশি পছন্দ করে। অচলা যদি সুরেশের ধন,বৈভব ও সম্পদের প্রতি প্রলুব্ধ না হয়ে শত অভাবের মধ্যেও নিজ স্বামীর প্রতি ভালোবাসা অটুট রাখত তাহলে তাদের গৃহদাহ হয় না। আর তার জীবন ও কলঙ্কিত হত না। সুরেশ যদি নিজ বন্ধু স্ত্রীকে মাতৃজ্ঞানে দেখত তাহলে সেও অচলার চেয়ে সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করে সুখী হতে পারত। মহিম অচলার দাম্পত্য জীবন চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন, "এ উপন্যাসে নায়িকা অচলার দোলাচল চিত্ততা এক অপরিণত নারীর 'মূঢ়তা'র দায়ে অভিযুক্ত। তবে ঘরে বাইরে বা যোগাযোগ উপন্যাসের তুলনায় শরৎচন্দ্র এক্ষেত্রে একটি সাহসী নিরীক্ষাশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। বিমলা মোহগ্রস্ত হয়েও অমূল্যের অদৃশ্য প্রেরণায় দ্রুত-মোহমুক্তি পথে ফিরে এসেছে। স্বামী চরিত্রহীন জেনেও কুমুদিনী কোন মূল্যেই বিপথগামীনি হয়নি। কিন্তু অচলা মুহূর্তের ভ্রান্তিতে, স্বামীর বন্ধু সুরেশের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছে। তারপরে অবশ্য অচলার পরম সম্পদ হারানোর শোচনীয় অনুভূতি হয়েছে।"[১০]

উপসংহার: পরিশেষে বলা যেতে পারে যে দাম্পত্য জীবনে ফাটল আধুনিক নর-নারীর দাম্পত্য জীবনের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। যা একটা অভিশাপও বলা যায়। সমাজ দ্রষ্টা বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র দাম্পত্য জীবনের চিড় ধরার পেছনে যে ত্রিকোণ প্রেমকে শনাক্ত করেছিলেন, তা আজ আমাদের চারপাশ ছেয়ে গেছে। সমাজের আনাচে-কানাচে কান পাতলেই ডিভোর্সের খবর মিলে। প্রতিটি কোর্টে শত শত ডিভোর্সের কেস ঝুলে আছে। সেখানে শিক্ষিত ডিভোর্সিদের সংখ্যা বেশি। বিশ্বায়নের যাঁতাকলে পিষ্ট নর-নারী সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও সুচরিত্র সম্পন্ন হওয়াতে কোথাও কিছু একটা ঘাড়তি নিশ্চয় হচ্ছে। দাম্পত্য জীবনে নর-নারী একে অপরের প্রতি ভালোবাসা, বিশ্বাস ও নিঃসন্দেহ যতক্ষণ অটুট রাখে ততক্ষণ তাদের দাম্পত্য জীবনে কোন সংকট আসে না। যেমন দেখা গেছে নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনী, নিখিলেশ বিমলা ও মহিম অচলার দাম্পত্য জীবনে। কিন্তু যেই মুহূর্তে তৃতীয় কোন ব্যক্তির প্রতি দম্পতির মধ্যে কেউ প্রভাবিত হয়েছে তখনই তাদের মধ্যকার ভালোবাসায় ঘৃণা জন্মেছে এবং বিশ্বাসে অবিশ্বাস জন্মেছে। ফলে অনিবার্যভাবে দাম্পত্যে কলহ সৃষ্টি হয়ে ধীরে ধীরে একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দাম্পত্য জীবনে পতন ঘটায়। সমাজবদ্ধ জীবনে দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি সংসারকে সুন্দর করে জগতকে সভ্য করে তুলে। সভ্যতার অগ্রগতির মূলে রয়েছে দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতা। তাই বঙ্কিম দাম্পত্য জীবনে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী কুন্দনন্দিনীর অকাল মৃত্যু ঘটিয়ে নগেন্দ্রনাথ সূর্যমুখীর দাম্পত্য জীবনকে পুনরায় গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ নিখিলেশ বিমলার দাম্পত্য জীবনে সংকট সৃষ্টিকারী সন্দীপকে দূরে সরিয়ে বিমলার অচিরেই মোহমুক্তি ঘটিয়ে নিখিলেশ বিমলার দাম্পত্য জীবনকে আবার গড়ে তুলতে চেয়েছেন। আর শরৎচন্দ্র মহিম

অচলার দাম্পত্য জীবনকে ধ্বংসকারী সুরেশের প্লেগ রোগে মৃত্যু ঘটিয়ে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে মহিম ও অচলার দাম্পত্য জীবনকে পুনরায় জোড়া লাগাতে চেয়েছেন। তাছাড়া বিমলা ও অচলার নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের ঘটনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র প্রকৃতপক্ষে দাম্পত্য জীবনে পবিত্রতার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তথ্যসূত্র :

১) আন্তর্জাল, https://bn.wikipedia.org.in, তারিখ ১৬/০১/২৫, সময় ২.৩৬ মিনিট।

২) চট্টোপাধ্যায় শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র, বিষবৃক্ষ, বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়, কাঁঠালপাড়া, কলকাতা -১, প্রথম প্রকাশ ১২৮০ বঙ্গাব্দ, পৃ : ৪৭।

৩) বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী শ্রীকুমার: বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা, প্রথম প্রকাশ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, মডার্ন বুক এজেন্সি, প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা,৭০০০৭৩,পৃ: ৬৫।

৪)আন্তর্জাল , https://ir.nbu.ac.in, তারিখ,১৫/০১/২৫, সময়, রাত্রি ২১:২৪, পৃ : ২৭৬।

৫) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ঘরে বাইরে, বিশ্বাস সাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৩৬৬, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৩, ঢাকা -১০০, পৃ : ২০।

৬)বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী শ্রীকুমার: বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা, প্রথম প্রকাশ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ ,মডার্ন বুক এজেন্সি, প্রাইভেট লিমিটেড , কলকাতা ,৭০০০৭৩,পৃ: ৯৩।

৭)আন্তর্জাল , https://ir.nbu.ac.in, তারিখ,১৫/০১/২৫, সময়, রাত্রি ২১:৪৪, পৃ : ২৭৮।

৮)বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী শ্রীকুমার: বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা, প্রথম প্রকাশ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, মডার্ন বুক এজেন্সি, প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা,৭০০০৭৩,পৃ: ১৪১।

৯) চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, গৃহদাহ, কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ মাঘ- ১৩৫৯, পৃ : ২০৪।

১০)আন্তর্জাল, https://ir.nbu.ac.in, তারিখ,১৫/০১/২৫, সময়, রাত্রি ২২:১৯, পৃ : ২৭৯।